বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক-অর্থনীতি: কি, কেন, কতদূর

ড. আবুল বারকাত

মৌলবাদ আসলে কি

"মৌলবাদ" সংজ্ঞায়িত করা সোজা নয়। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বিজ্ঞান চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'মৌলবাদ' বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি বিষয় বোঝানো যেতে পারে। ধর্ম-নির্বিশেষে বিজ্ঞান চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোর বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটা এমনই এক বিশ্বাস যা প্রতিনিয়ত আদর্শিক সংঘর্ষের জন্য তৈরী থাকার প্রেরণা যোগায়। বড় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম, ইহুদি তথা হিন্দু, বৌদ্ধ এমনকি কনফুসিয়াস মতবাদের অনুসারীদের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে মতাদর্শের প্রভাব যতটা প্রবল ইসলাম বা ইহুদির বেলায় ততটা জোরালো নয়। সব ধর্মের মৌলবাদীরা নির্দিষ্ট এক ছকের অনুসারী। তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রামের চেতনায় সদা প্রস্তুত। তাই ধর্ম নিরপেক্ষ ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসীদের সাথে মৌলবাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। মৌলবাদীরা তাদের আদর্শগত এই সংগ্রাম-সংঘর্ষকে প্রচলিত অর্থের রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বরং তাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধ হচ্ছে শুভ এবং অশুভ শক্তির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী লড়াই। অস্তিত্ব হারানোর প্রচ্ছন্ন এক ভীতি মৌলবাদীদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রায়শ তারা সামাজের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেরা বিকল্প এক চেতনার উদ্ভব ঘটায়। তারা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনও বা মনোনিবেশ করে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষে। মৌলবাদীরা বাস্তবতা বিবর্জিত কোনো ধ্যান ধারনার অনুসারী না। তারা তাদের মূল আদর্শকে অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন মতাদর্শের সূচনা করে। তারা মৌলবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মেলে ধরে যথেষ্ট যুতসই কর্মপরিকল্পনা। মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীকে সৃষ্টি কর্তার কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে তারা জটিল সব পৌরাণিক কাহিনীকে সর্বজন উপযোগী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মধ্যে তৈরী হয় ক্ষোভ। তারা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা পরায়ন। ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতাটাই তারা দখল করতে চায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মের ধারণা সমষ্টির সাথে বাস্তব জীবণের অনেক মৌলিক বিষয়াদির সম্মিলনই তাদের "মতাদর্শ"। চরম বৈষম্য সৃষ্টিকারী সমাজ ব্যবস্থায় এ মতাদর্শ যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পাবার যুক্তিসঙ্গত কারণ অনেক।

মৌলবাদী জঙ্গীত্ব– বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও গভীরতা

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গীরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু। এ শত্রুদের প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন তারা ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী এ জঙ্গীরা ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই এখন দখল করতে চায়। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। ওদের জঙ্গীত্ব ক্রমান্বয়ে অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করছে– প্রথমে নিরীহ বেশে ধর্মের বাণী, তারপরে শরীর চর্চার নামে একটু-আধটু প্রশিক্ষণ, তারপরে পটকার খেলা, তারপরে স্পিলিন্টার ছাড়া বোমা, তারপর পিস্তল-রিভলভারের খেলা-প্রদর্শন, তারপর সভাস্থলসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি হত্যার প্রয়াস, তারপর বাঙ্গালী জাতিকে রাজনীতিবিদ শূন্য করার প্রচেষ্টা, তারপর এক সাথে একই সময়ে দেশের সব জেলা শহরের সরকারি অফিস ও বিচারালয়ে বোমা, তারপর বিচারক হত্যা, আর সবশেষে সুইসাইড বোমা। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের ক্রমধারা যা তাতে স্পষ্ট যে ওরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং সুইসাইড বোমাই শেষ কথা নয়। যদি নিরস্ত্র করা না যায় তাহলে সামনে সম্ভবত আরো বড় মাপের নূতন ধরনের বিপর্যয় ঘটবে যা হয়তো বা এ

মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এ কোনো সাধারণ সংকট নয়– প্রকৃত অর্থেই মহা-বিপর্যয়; গভীর সংকটের এ এক ক্রান্তিকাল।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাবে এমনিতেই দেশের অর্থনীতি দুর্বল আর এখন যত্রতত্র এবং মোটামুটি প্রাত্যহিক জঙ্গীত্ব দুর্বল এ অর্থনীতিকে দুর্বলতর করছে। ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন মানের (যা এমনিই বেশ ভঙ্গুর) দ্রুত অধোগতি ঘটছে, আর অন্য দিকে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তিত। এ অবস্থায় আর যাই হোক সুশৃংখল কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কারো উৎসাহ-প্রেরণা থাকার কথা নয়। অন্ধকার এক স্থবিরতার দিকে এগুচ্ছে দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ এখন প্রকৃত অর্থেই এক মহাবিপন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীবাদ। এ জঙ্গীবাদ অতীতে তাদের জঙ্গীত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; প্রায় প্রতিদিনই তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করছে এবং প্রতিদিনই তারা নিরীহ মানুষ হত্যা করছে; তাদের বোমায় ইতোমধ্যে বহু নিরীহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার মানুষ এবং প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছেন এবং প্রায় সকলেই একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। আবার ইদানিং বেশ কিছু জঙ্গী সংশ্লিষ্টদের ধরা হয়েছে যাদের পারিবারিক অবস্থান উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী– যা মানসিকতার দারিদ্র-উদ্ভূত এবং সাংস্কৃতিক দারিদ্র-উদ্ভূত মৌলবাদ নির্দেশ করে। সে সাথে গবেষণায় দেখা যায় যে এসব জঙ্গীরা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে যা দেশজ ও বিদেশি উভয় উৎসের সাথে সম্পর্কিত।

উগ্র সশস্ত্র জঙ্গীবাদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে অন্তত গত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে দেখা গেছে যে জঙ্গী ধরা পড়লে ক্ষমতার ভিতরেই কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেবার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন; চিহ্নিত জঙ্গীদের ধরে ছেড়ে দিতে হয়েছে; আর তাদের মুখ্য নিয়ন্ত্রক গড-ফাদার'রা সর্ম্পূণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। সরকারের অন্দর মহলের সদিচ্ছা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যখন "সবই মিডিয়ার সৃষ্টি" বলে জঙ্গীবাদকে তুচ্ছ করা হয়; যখন বলা হয় জঙ্গীবাদীদের সাথে সরকারের অন্দর মহলের কোনোই সম্পর্ক নেই অথচ অন্দর মহলের কেউ কেউ আবার সুনির্দিষ্টভাবে এ সম্পর্কের কথা বলছেন; যখন জঙ্গীবাদী বলে কোন বেসরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করে আবার তারই নামে ২ কোটি টাকার বাহক-চেক পাশ করা হয়; যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের ভিতরেই দ্বিধাবিভক্তি স্পষ্ট; যখন জাতীয় মসজিদের মূল ইমাম সাহেব একই সাথে বলেন যে ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ-ওরা বিপথগামী তবে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে; যখন বলা হয় ওদের গতি আমাদের চেয়ে বেশি; যখন বলা হয় আসছে কয়েক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে আর একই সাথে বলা হচ্ছে এটা গ্লোবাল সমস্যা (অর্থাৎ আমাদের করার কিছু নেই) ইত্যাদি। এ অবস্থাকে দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন-নিরাপত্তা ও সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এখন অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা চলে।

মহা-সংকটটি এমনি যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মান্ধ রাজনীতিকরা অনেক গুরুতর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলেছেন। এখনও বলছেন। যেমন তারা বলেন:

১. "১৯৭১ আর ২০05 সাল এক কথা নয়"।

২. "আমরা কচুপাতার ওপর বৃষ্টির পানি নই যে টোকা দিলেই পড়ে যাবো"।

৩. "কোথায় আজ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, আর আমরা আজ কোথায়" (?)

৪. "সংসদের কয়েকটি আসন দিয়ে আমাদের শক্তির বিচার করলে ভুল করবেন"।

৫. "শীঘ্রই ইসলামী শাসন কায়েম হবে। দেখুন-অপেক্ষা করুন; পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন"।

৬. "ইসলামে আত্মহত্যা পাপ তবে ইসলামী শাসন/হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"।

৭. "জ্ঞানপাপী মানুষ প্রণীত সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করতে সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে দেশে যতদিন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয় ততদিন তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন"।

৮. "সশস্ত্র জেহাদ করা আমার অধিকার, আর ঐ জেহাদে অংশগ্রহণ আমার দায়িত্ব। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই"।

ইসলামী জঙ্গীত্ব-উদ্ভূত মহাসংকটের গভীরতা এখানেও যে ইতোমধ্যে ধৃত জঙ্গীদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, প্রায় সবাই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে এসেছেন, প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন অথবা আছেন। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে এখন পর্যন্ত ধৃত ১৫০০ জঙ্গীদের গড় বয়স মাত্র ২২ বছর (১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে)। অথচ ১০-১৫ বছর আগে গণমাধ্যমে জঙ্গী প্রশিক্ষণের যেসব সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল অথবা ১০-১৫ বছর আগে যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বার্মাতে জঙ্গী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের বয়স তো এখন হবে ৪০-৫০ বছর– তারা কোথায়? আর যারা ১৯৭১-এ আল বদর-আল শামস-রাজাকার-শান্তি কমিটির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন এবং/অথবা মুখ্য পরামর্শদাতার কাজ করেছিলেন তাদের বয়স তো এখন ৫৫-৮০ বছরের মধ্যে– তারা কোথায়? অর্থাৎ সম্ভবত গডফাদারদের আড়াল করার জন্যেই দেশি-বিদেশি চাপে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে বিগত সরকারের আমলে এখন লোক দেখানো ফ্রন্ট-লাইনের দু'একজন ধরে ধরে দেখানো হয়েছে। এসব গডফাদার এখনও বহাল তবিয়তে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করারও এ এক নবতর কৌশল হতে পারে। মহাবিপর্যয়টি এখানেও। আসলে শর্ষের মধ্যেই ভূত। আর ভূতের জন্মবৃত্তান্ত না জানলে ভূত তাড়ানো অসম্ভব।

মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি – কিছু যোগসূত্র

"মৌলবাদের অর্থনীতি" তুলনামূলক এক নতুন ধারণা। মৌলবাদের অর্থনীতি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক ঘনীভূত প্রকাশ। মৌলবাদের অর্থনীতি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরুদ্ধ। এক কথায় এ অর্থনীতি আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতা উদ্ভূত ৭২'এর সংবিধানের মূল চেতনা বিরুদ্ধ। জনকল্যাণমুখী বিকাশ-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক মানস কাঠামো সৃষ্টির ব্যর্থতা থেকেই পুষ্ট মৌলবাদ ও তার অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজনীতি। এ ব্যর্থতাই মৌলবাদের অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও পুনরুৎপাদনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ ব্যর্থতাই ধর্মের নামে জোর জবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে উদ্যত জঙ্গীবাদের সীমাহীন জঙ্গীত্বের প্রধান কারণ। যে জঙ্গীত্বের নৃশংস-অসভ্য বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখলাম ২০০৫-এ।

গত শতাব্দির প্রথমার্ধে সমাজতন্ত্রের উত্থান আর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভাঙ্গন-পরিবর্তন, উন্নত পুঁজিবাদি দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসি মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ, পৃথিবীর এক মেরুয়ায়ন আর বিশ্বায়নের ডামাডোল ধর্ম-ভিত্তিক মৌলবাদের উত্থানে গতি বৃদ্ধি করেছে। সাম্রাজ্যবাদ মৌলবাদের উত্থান ত্বরান্বয়নে কোথাও প্রধান ভূমিকা পালন করেছে (তালেবানইজম, মোল্লা ওমর, বিন

লাদেন কাদের সৃষ্টি?), আবার কোথাও স্বার্থ উদ্ধারের পরে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় মুনাফা সমীকরণ দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদ কখন কোথায় কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তা নির্ভর করছে তার নিজস্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমীকরণে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ওপর– যেখানে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বার্থটিই প্রধান। কারণ ৩০০% মুনাফা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে ফাঁসির সম্ভাবনা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই যার ঝুঁকি পুঁজি নেবে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সাথে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার অর্থনীতি ও রাজনীতির উত্থান ও বিকাশ যেমন সাযুজ্যপূর্ণ তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর বিকাশের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট ধরনের মৌলবাদ বাধার কারণ হলে তা প্রতিস্থাপিত হবে অন্য রূপের সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে– এটাও লক্ষণীয়। তেল-গ্যাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পানি সম্পদের ভৌগলিক অর্থনীতি, গ্রহ-উপগ্রহ দখল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বের অর্থনীতি, বিশ্ব বাজারে (তথাকথিত 'অবাধ বাজার' আর বিশ্বায়নের নামে) কর্তৃত্ব স্থাপনের রাজনৈতিক অর্থনীতি– বর্তমান যুগে এসবই মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার অন্যতম অনুষঙ্গ।

বহি:স্থ ও অভ্যন্তরীণ উভয় উপাদানই ধর্মের উদারনৈতিকতার বিপরীতে সংকীর্ণতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। একদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়– যেমন যুক্তরাষ্ট্রের চলতি একাউন্ট ঘাটতি বছরে ৫০০-৬০০ বিলিয়ন ডলার, বিশ্ববাজারে পেট্রোডলারের বাড়-বাড়ন্ত ও অস্থিরতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমন, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলা এবং পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সাম্রাজ্যবাদের অযৌক্তিক অতি-প্রতিক্রিয়া, "উন্নত" বিশ্বে মুসলমান নামধারীদের প্রতি প্রকাশ্য সন্দেহ-অবিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলভাণ্ডার সমৃদ্ধ দেশ ইরাক আক্রমণ ও দখল, গোলাকায়নের গোলকধাঁধায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপসংস্কৃতি প্রচার, আর অন্যদিকে আমাদের দেশে দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা-বিপন্নতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহায়ত্ব– এসব কিছুই ধর্মের উদার ধ্যান-ধারণার বিপরীতে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রাখছে। এসব সুযোগ ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক, আর সে চাহিদা পূরণেই মৌলবাদী অর্থনীতির উদ্ভব বলা যায়। এ দু'টি একে অন্যের পরিপুরক– যৌথভাবে তাদের লক্ষ্য 'ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল'।

শান্তির ধর্মের রাজনীতিকরণ– কিভাবে ঘটলো?

এখন প্রায়ই শুনি যে 'সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব-সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিপর্যয়টি সৃষ্টি হয়েছে ২০০৫ এর ১৭ আগস্ট'-এ। এ বিশ্লেষণে আমার অসুবিধা আছে। কারণ এ দিনটিকে মহাবিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশের অনেক দিনের একদিন বলা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় বহিপ্রকাশের অন্যান্য দিন-তারিখও আছে– যেমন ৬ মার্চ ১৯৯৯ (উদীচী, যশোর), ১৪ এপ্রিল ২০০১ (পয়লা বৈশাখ, ঢাকা), ৭ ডিসেম্বর ২০০২ (সিনেমা হল, ময়মনসিংহ), ২১ মে ২০০৪ (শাহজালাল দরগা, সিলেট), ২১ আগস্ট ২০০৪ (শেখ হাসিনার সভা, ঢাকা) ইত্যাদি। আর ১৯৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী নিধন এবং ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পরিবার-পরিজনসহ হত্যা কি আজকের সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের সাথে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়? সুতরাং, মহাবিপর্যয় এক দিনে সৃষ্টি হয়নি এবং তা অপরিকল্পিতও নয়। বিপর্যয়ের উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে একটু একটু করে। আর সেই সাথে এক সময়ের উদারনৈতিক-মানবতাবাদী ইসলাম রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামে। আজকের জঙ্গীবাদী মহাবিপর্যয়ের কার্যকরণ যোগসূত্র বুঝতে হলে এ প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি-ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকেরা যা কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ এবং নয় তা যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক। ভূগোল, নদীর প্রবাহ পরিবর্তন, কৃষি সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, ভূমি খাজনার গতি প্রকৃতি, ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক গ্রন্থনা, হিন্দু রাজা ও মুসলমান সম্রাটদের রাজ্যনীতি– পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাস রচনায় এসব তথ্যের নির্মোহ বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। সংশ্লিষ্ট ইতিহাস রচনার তত্ত্ব এদিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাসে মূলত: চার ধারার বক্তব্য পাওয়া যায়: অভিবাসন (immigration), তরবারি (sword), পৃষ্ঠপোষকতা (patronage), ও সামাজিক মুক্তি (social liberation)। ইতোমধ্যে উল্লিখিত কারণে এসবের কোনোটিই পুর্ণাঙ্গ নয়: অভিবাসিত কারা, কখন-কোন সময়ে-কি কারণে অভিবাসন হলো (?); তরবারির শক্তি কখন কোথায় এ দেশে ইসলামকে গণধর্মে (mass religion) রূপান্তর ঘটালো (?); এমনকি সবচে' বেশি রক্ষণশীল মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবও জোরজবরদস্তি উৎসাহ দেননি (আকবর বৈষম্যমূলক খাজনা বন্ধ করেছিলেন; হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন) ইত্যাদি।

নির্মোহ ইতিহাসটি এ রকম– এদেশে ইসলাম ধর্মের মূল প্রচারকেরা অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামারা শত শত বছর ধরে কোনো উগ্র ধর্মীয় আচার প্রচার করেননি; এমনকি তাঁরা তা সমর্থনও করেননি। উল্টো তারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচারের স্থান যেমন মাজার, মসজিদ, মাদ্রাসাকে রেখেছিলেন আয়তনে ছোট, আর বড় করেছিলেন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি কাজের এলাকা। অর্থাৎ তারা মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে-মূলত: কৃষি কাজে। সেই সাথে সুফিরা যত না অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে। "আশরাফুল মাখলুকাতের সেবাই ধর্ম"– এ তাদেরই কথা। সুফিরা কখনও কোথাও অন্য ধর্মের উপাসনালয় ভেঙ্গেছেন– এ দেশের ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই। আসলে সুফি-ওলামারা ইসলাম ধর্মের মতাদর্শের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৃষি কাজের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে তরবারি অথবা অভিবাসন অথবা পৃষ্ঠপোষকতার তেমন কোনো ভূমিকা নেই; এখানে ইসলাম বিকশিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে। ইসলাম ধর্মের সুফি সাধকসহ অন্যান্য অনেক ধর্ম প্রচারক এ দেশে সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন; এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন। সুফি-ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই তা করেছেন। শুধু তাই নয় বাংলায় মুসলিম শাসনের সাথে ইসলামীকরণের অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই[১]। সুতরাং উদ্ভব সূত্রে এ দেশে ইসলাম মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও সেক্যুলার[২]। অর্থাৎ এ দেশের মুসলমানেরা ঐতিহাসিকভাবেই এক পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক। আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের এ পজিটিভ ডিএনএ-র ঐতিহাসিক উপস্থিতির কারণেই সশস্ত্র জঙ্গীত্ব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না।

ঐতিহাসিক উদ্ভব সূত্রে যে ইসলাম মানবতাবাদী তা কেনো, কিভাবে রাজনৈতিক ইসলামে রূপান্তরিত হ'লো? ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব কিভাবে এলো? এর পিছনে আমি প্রধানত ছয়টি কারণ খুঁজে পাই। প্রথমত: ইসলাম ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭); দ্বিতীয়ত: ১৯৭১-এ স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থতা; তৃতীয়ত: ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তৃতির পথ প্রশস্ত করা; চতুর্থত: ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি সেক্যুলারইজম বর্জন করে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে ধর্মকে

[১] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat (2005), "Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth", presented at Cornell University, USA, 15 October 2005.
[২] 'সেক্যুলারইজম' ১৯৭২-এর সংবিধানের চার ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি। প্রত্যয়টির প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেউ কেউ ধর্মহীনতার সাথে সমার্থক করে থাকেন সেহেতু মর্মার্থ বিকৃতি দূর করতে ইংরেজি সেক্যুলারইজম/সেক্যুলার প্রত্যয়দ্বয় ব্যবহার করেছি।

রাষ্ট্রের অংগে রূপান্তর এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্বীকৃতি দেয়া (আসলে বাংলাদেশ হয়ে গেলো বাংলাস্তান); পঞ্চমত: স্বাধীনতা উত্তর কালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন পরিপুষ্ট করা; এবং ষষ্ঠত: অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-বঞ্চনা সৃষ্টির সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা। এ বৈষম্য-বঞ্চনা একদিকে যেমন অন্য পাঁচ কারণ থেকে উদ্ভূত আর অন্যদিকে এ বৈষম্য-বঞ্চনা নিজেই জঙ্গীত্ব পুনরুৎপাদনে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে কাজ করে।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বড় মাপের পশ্চাদমুখী বিপর্যয় ঘটেছে গত শতাব্দিতে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এলো– অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তিক দেশ বিভাজনে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক ধারার বিপরীতে পশ্চাদমুখী এ রূপান্তর হঠাৎ ঘটেনি– এর পিছনে একসাথে কাজ করছে ধর্মের জঙ্গিবাদী সুনির্দিষ্ট ধারা (যেমন মওদুদীবাদ ইত্যাদি), দু'শতাব্দির ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, এবং হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার। ফলে ইসলাম ধর্মের মানবকল্যাণকামী সুফি-ওলামা চেতনার এক ঋণাত্মক উত্তরণ ঘটলো– যা ছিলো উদারনৈতিক-মানবতাবাদী তা রূপান্তরিত হলো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায়, উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশে এক পশ্চাদমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হল। আর তা হলো কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা থেকে সশস্ত্র মৌলবাদী ধারণাপুষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রবণতা। পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এ ধারা এতই প্রবল হলো যে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দুদের "হিন্দুস্থানী" বানাতে তৎকালীন ধর্ম ব্যবসায়ী সামন্ত-সেনা শাসকদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগেনি– জারি করলেন "শত্রু সম্পত্তি আইন" যেখানে হিন্দু মাত্রেই শত্রু। রাষ্ট্র-পরিতোষিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এমন নমুনা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগ ঘটেছে সাধারণ মানুষকে (হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান যে ধর্মই হোক না কেন) জিজ্ঞাসা না করে; তাদেরকে দেশ বিভাগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না করে: তাদের মতামত উপেক্ষা করে– যে কারণে সমসাময়িক সময়ে একদিকে যেমন ধোকাবাজি স্লোগান ছিল "হাত মে বিড়ি মু মে পান লাড়কে ল্যঙ্গে পাকিস্তান" আর অন্যদিকে সুদূরপ্রসারি চিন্তার মানুষরা বলেছিলেন "ইয়ে আজাদি ঝুটা হায় লাখো ইনসান ভূখা হায়"। ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগটা হয়েই গেলো (তাতে মানুষের মতামত নেবার প্রয়োজন পড়েনি)। মোটামুটি এক ধর্মের মানুষের সংখ্যাধিক্য আর রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্ম ব্যবহারের আধিক্য হেতু সামন্ত-চেতনার পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে ধর্মীয় জঙ্গিত্ব যত প্রবল রূপ নিলো ভারতে ঠিক ততটা হলো না। কারণ বিশাল ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাহার এবং সেই সাথে শুরু থেকেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশে সাম্য-সমতাধর্মী বিষয়াদিকে সংবিধানিকভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্র পরিচালন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে– কিছু হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন"। মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবৎ রাখতে "ইসলামের বিপন্নতা" ছিল একমাত্র স্লোগান। সবশেষে এটাই ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে– "ইসলামের বিপন্নতা" ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন পাঞ্জাবী-সিন্ধি-বেলুচ সৈন্য আনা হয়েছে তখন। একই স্লোগান ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গুটি কয়েক বাঙ্গালী মুসলমান নিয়ে শান্তি কমিটি, আল বদর, আল শামস, রাজাকার ইত্যাদি বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায়। এসব যুদ্ধাপরাধীরা নিশ্চিত ছিল যে মুক্তি-স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীরা পরাক্রমশালী পাক সেনাবাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের কাছে পরাজিত হবে। উল্টোটা ঘটেছে। অনেক রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধি যুদ্ধাপরাধী জাতীয় শত্রুদের কোনো ধরণের শাস্তির

বিধান আমরা কার্যকর করতে পারিনি। এটাও পরবর্তীকালে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানে জঙ্গী প্রশিক্ষণ, আফগানিস্তানে তালেবান প্রশিক্ষণ, বার্মায় জঙ্গী প্রশিক্ষণ, দেশের ভিতরে জঙ্গীত্ব বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড– এ সব তারাই সংগঠিত করেছে; এসবের একই উৎস, একই লক্ষ্য। ধর্ম ব্যবসায়ী সংগঠিত এ গোষ্ঠি এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কিছু অনুসারীরাই বাংলাদেশে মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীবাদী রাজনীতির চালক। এদেশে ধর্মের ইতিহাসে এ এক চরম বিকৃতিকাল– বলা যায় পশ্চাদমুখী রূপান্তরের দ্বিতীয় কালপর্ব। এ দেশে ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক মূল ধারার বিকাশের সাথে বর্তমান মৌলবাদী রাজনীতি-অর্থনীতির বিপরীতধর্মী পার্থক্যটা এখন স্পষ্ট।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা শুধু রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবেই কাজ করেনি তা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই অর্থনীতির বৈষম্যে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের– যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা, অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উচ্ছেদ হবে বঞ্চিতদের বঞ্চনা-দুর্দশা, উন্মেষিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা, সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, প্রস্ফুটিত হবে ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। আর আশা ছিল যে এসব কিছুই ঘটবে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সেক্যুলার মানস-কাঠামো ও জীবন আচরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়। এই ছিল আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের মর্মবস্তু যেখানে সুস্পষ্ট বলা "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। এ লক্ষ্যে সংবিধান মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারের অঙ্গীকার করে প্রকাশ্যে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ অঙ্গীকারের সাথে বাস্তবের ফারাক ক্রমাগতভাবে এতই বেড়েছে যখন মৌলবাদের অর্থনীতি ও জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক জঙ্গী রাজনীতির বিস্তৃতি অবশ্যই অবাস্তব নয়।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীত্ব বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল নয়। তার কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু একদিকে যেমন চিরাচরিত সামন্তবাদী মানস কাঠামো বিলুপ্ত হয়নি তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি, যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না। "ব্রিফকেস পুঁজিবাদ" বিকাশে শিল্প-ভিত্তিক চিরায়ত পুঁজিবাদের তুলনায় "শকুন পুঁজিবাদ" অনেক বেশি অনুকূল। এই পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল শিল্প-কৃষি নির্ভর অর্থনীতির চেয়ে নগরভিত্তিক ভূমি-ব্যবসা এবং দোকানদারী অর্থনীতি বিকাশে অনেক বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই এই পদ্ধতি উদ্বৃত্ত শ্রমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। হচ্ছে না দারিদ্র বিমোচন। যে দারিদ্র অর্থনীতি থেকে মানসিকতার দারিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এ ধরনের মুক্তবাজার অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র-বান্ধব নয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশের জাতীয় পুঁজি-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বদলে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তাও মৌলবাদ পুষ্টিতে সহায়ক।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা উত্তর তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদ-হীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্খা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটাও মৌলবাদ তোষণে সহায়ক।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে গত তিন দশকের বিকাশের ধারা ১৫ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে: প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ; আর দ্বিতীয় ভাগে

আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৪ কোটি ৯০ লাখ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৪ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা উন্নয়নে বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেনো?

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশে মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর ধনীদের বেড়েছে– একথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। মনে রাখা প্রয়োজন যে গত ২০ বছরে এ দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে; আর সেই সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন। একই সময়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। এসবই ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদের অর্থনীতি গঠনের সহায়ক উপাদান।

গত তিন দশকে এদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশে মূল প্রবণতা হ'ল: ১০ লাখ দুর্বৃত্ত ১৪ কোটি ৯০ লাখ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যালঘিষ্ঠ দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে। মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশ সহায়ক গত তিন দশকের খেরোখাতা (সারণি ১ দ্রষ্টব্য) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। উন্নয়নের খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভাল হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে। গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব হয়েছেন (আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন); সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ।

সারণি ১: মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্ভব-সহায়ক গত তিন দশকের খেরোখাতা

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
কালো অর্থনীতি/কালো টাকা এবং সংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুণ্ডি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন, সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা
কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয় দখল; নতুন গাড়ী-ফ্লাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; যাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের প্রথম শর্ত); সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউক্লিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলা ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরী; সম্প্রসারিত (বর্ধিত) একান্নবর্তি পরিবার
বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও যোগযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি ; বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পীর-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞান মনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও মানস-কাঠামো
ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র উদ্ভুত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভুত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদদের দালালী; রাজনীতিকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র-উদ্ভুত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভুত নি:স্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা; বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষির সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ ও মানস কাঠামো– এক কথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি ।

এসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫০০০ টাকা । শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত । উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি আত্মঘাতি বোমাবাজদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের ধারণা-কাঠামো প্রযোজ্য ।

অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়নের ধারা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলের শ্রেণী কাঠামো বদলে দিয়েছে । আর্থ সামাজিক শ্রেণী কাঠামো যেভাবে বদলেছে তা উগ্রসাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিকাশের অনুকূল । বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক

শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দারিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটি কয়েক ধনীক শ্রেণীর হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টিও স্পষ্টতর করে। নিচের বৈশিষ্টগুলো আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার সে চিত্রটিই তুলে ধরে যা দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব (সারণি: ২)।

সারণি ২: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর গতি প্রবণতা, ১৯৮৪-২০০৪

গ্রাম/শহর	গরীব (কম সম্পদ)		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট মধ্যবিত্ত					
	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪	১৯৮৪	২০০৪
গ্রাম														
(ভূমি মালিকানাভিত্তিক)														
গ্রামীণ জনসংখ্যার শতাংশ	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৭৭	১৪	১৮	১০	১০	৪	৩	২.৮	৩১	৩	২	৮৪	১১০
শহর														
(সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
শহুরে জনসংখ্যার শতাংশ	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৪	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৪	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৪	৫	৬	৩	৫	০.৫	৩	৮.৫	১৪	০.৩	২	১৬	৩০
মোট (গ্রাম+শহর)														
মোট জনসংখ্যার শতাংশ	৬০	৬৫	১৯	১৭.১	১৩	১০.৭	৪.৫	৪.৩	৩৬.৫	৩২.১	৩.৩	২.৯	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	৯১	১৯	২৪	১৩	১৫	৪.৫	৬	৩৬.৫	৪৫	৩.৩	৪	১০০	১৪০

পদ্ধতিগত ধারনা: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারীভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে লেখক দেশের সমাজ কাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর জনসংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মানদণ্ড হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির বসত ভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণীকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণী– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠির সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের মুল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদোর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

আমার হিসেবে ২০০৪ সালের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (মোট জনসংখ্যার ৬৫%), সাড়ে চার কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (৩২.১%) এবং অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ মানুষ (২.৯%) ধনী। দুই দশক আগে বেড়েছে অতিরিক্ত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি মানুষ অর্থাৎ গত বিশ বছরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের ব্যর্থতারই বহি:প্রকাশ। যা বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উগ্রতাকে উৎসাহিত করার ভিত্তি মজবুত করেছে।

শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণী মানুষের আধিক্য বেশি। শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রামে এবং ১৫ ভাগ শহরে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা ভূমিহীন। শতকরা ৮০ খানাতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই[৩]। শতকরা ৬৫ জন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে শহরায়ন মুলত: বস্তিয়ায়ন অথবা শহুরে জীবনের গ্রামীনিকরণ। যেখানে ঘটে না শিল্পায়ন[৪], বিস্তৃতি ঘটে অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহ। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য অত্যন্ত উর্বর সহায়ক ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করে।

[৩] বিস্তারিত দেখুন: Barkat Abul (2005) “Bangaladesh Rural Electrification Program: A Succes Story of Poverty Reductoin through Electricity”
[৪] বিস্তারিত দেখুন: Barkat Abul and S Akhter (2001) “Mushrooming Population: The threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh”

বিগত ২০ বছরে (১৯৮৪-২০০৪) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমান ৫২%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় দারিদ্র তাড়িত মৌলবাদের বৃদ্ধির পরিমাণও গত বিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারক বর্তমানে সাড়ে চার কোটি, যার মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৫০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং অবশিষ্ট ৬০ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষত অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়। ধর্মীয় মৌলবাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠিও এদের কব্জায়।

তাহলে গত দু'দশকে এ দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের যে প্রবণতা দেখা যায় তা হলো: বিগত ২০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠির ৭৮% জনকে দরিদ্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ মূলত: নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নিম্নগামী প্রবণতার কারণে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই শহর কেন্দ্রিক। কিন্তু শতকরা ৬৭ ভাগ মধ্যবিত্তের বাস গ্রাম এলাকায় (যাদের ৬০% নিম্নবিত্তের ধারক)। বিগত ২০ বছরে মধ্যবিত্ত ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ৮৫ লক্ষ (৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৯৮৪ সালে এবং ৪ কোটি ৫ লক্ষ ২০০৪ সালে)। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা সংগঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উপরে উঠতে দেয় না বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। বিগত ২০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগোষ্ঠি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩.৩%-এ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ২৬.৩% বৃদ্ধি হয় তখন একই সময়ে নিম্নমধ্যবিত্ত গোষ্ঠির একটা বৃহৎ অংশ দরিদ্রে রূপান্তারিত হয়েছে। ২০০৪ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণী) জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ। বিগত ২০ বছরে ৭ লক্ষ মানুষ ধনীক শ্রেণীতে যোগ হয়েছে অর্থাৎ ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ধনীক শ্রেণীর বৃদ্ধি হয় ২১.২% (এ বৃদ্ধির হার নিম্ন) আরও গুরুত্বসহকারে বলা যায়, ধনীক শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধি অংশ মোট জনসংখ্যার নিরিখে ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে ৩.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২.৯%-এ (২০০৪) দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির ওপর গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্য-স্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ১০% ধনী মানুষ আছে যারা সমগ্র ধনীক শ্রেণীর অধিকাংশ ৯০ শতাংশ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অতএব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিকাশের প্রবণতা থেকে এটা ভারসাম্যের গঠন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র অবস্থা আরও প্রকট হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দারিদ্র সীমার কাছাকাছি উপনীত হয়েছে। নগণ্য সংখ্যক ধনীক শ্রেণীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে। এই প্রকট গণদারিদ্র এবং ব্যাপক অসমতা-বৈষম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অস্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে নগ্ন অতিসম্পদশীলতার ভিত্তিভূমি তৈরী হয়েছে অতি অল্প সংখ্যক ধনীক গোষ্ঠির ক্ষেত্রে যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ এবং মৌলবাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে।

সুতরাং বিশ্লেষণে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যদিও কয়েক শতাব্দির ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত অর্ধশতাব্দির (ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর বিশ্বায়নসহ উন্নয়নের অনেক উপাদানই এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতির বিস্তৃতি ও প্রবণতা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্খিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহি সংসদ। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের নিদর্শকসমূহ নিম্নরূপ: গত তিন দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে ২ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫% লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা আসলে ২ লাখ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লাখ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যা জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ), এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত, এরাই প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি, এরাই সবধরণের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যাক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোন সরকারি ক্রয়ে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) অথবা বড় ধরণের বিনিয়োগে এদেরকে কমপক্ষে ২০% কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী: অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যাক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ১ কোটি টাকা থেকে ২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিশ করেন। যেমন ব্যবসায়ী'রা ছিল ১৯৫৪ -এর সংসদে ৪% আর সর্বশেষ সংসদে ৮৪%, অবশ্য "ব্যবসাটা" যে কি তা নির্বাচন কমিশনও সঠিক জানে না। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই– এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান[৫]।

প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রি রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন/হারিয়েছেন, আর প্রগতির ধারাও সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি/হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। তারা চোখের সামনে দেখেছেন কেমন করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি এমনকি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল গণতন্ত্র চর্চার স্থান ভারতেও দুচারটে সংসদ আসন দখল করে ১০/১৫ বছর পরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। অন্যান্য অনেক উদাহরণসহ এটাও বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণে তাদের স্বপ্নকে বাস্তব করবে বলে তারা মনে করে। আর তারা স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভীত প্রয়োজন। অন্যথায় ক্যাডারভিত্তিক দল গঠন ও পরিচালন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মডেল চর্চা সম্ভব নয়।

[৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Barkat Abul, "Criminalization of Politics in Bangladesh", SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005; "Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh", Lecture Session organized by Sida and Föreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তার মধ্যে ১২-টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাভাই (এবং অনুরূপ প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম), এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান (ছক ১ দ্রষ্টব্য)। এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবি সমিতি)- এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে আমার দৃষ্টিতে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির তুলনামূলক সুবিধা তাদের আছে।

ছক ১: মৌলবাদের আর্থ-রাজনৈতিক সাংগঠনিক মডেল

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠনগুলো আপাতদৃষ্টিতে মূলধারার ইসলামপন্থী দলের থেকে আলাদা– জঙ্গীরূপ। বাংলাদেশে মোট ১২৪টি এই রকম জঙ্গী-মৌলবাদী দল আছে যারা প্রকাশ্যে কাজ করে না। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ আল-হারাত আল-ইসলামীয়া, আল্লার দল ব্রিগেড, আলমার্কাজুর আল ইসলামী, আল-জিহাদ বাংলাদেশ, আহলে হাদিস, আলকুরআত, আল ইসলামী শহীদ ব্রিগেড, আল-খিদমত, আমিরাতে-দিন, আল-সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী, আল-তানজীব, আরাকান মুজাহিদ পার্টি (এবং অন্যান্য দলও 'আরাকান' নাম ব্যবহার করছে), হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল ইসলাম আল-জিহাদ, হিজবুত তাওহীদ, হিজবুত তাহির, ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ, ইকতাদুল-তালাহ আল-মুসলেমিন, জামাআতুল মুজহাদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা (জেএমজি), জয়সী মোহাম্মদ, জয়সী মোস্তফা, জঙ্গি হাকিকত, জামায়াতুল ফালাইয়া, জামায়াত-এ-ইয়াহিয়া জুমাতুল আল সাদা'ত, শাহাদাত-এ আল-হিকমা, শাহাদত-এ-নব্যুয়ত, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, হিজবুল মাহাদী, ইবনে দায়াতুল আলমুসলেমিয়া, জামিয়াতি ইসলামি সলিডারিটি ফ্রন্ট, রোহিংগা ইণ্ডিপেন্ডেস ফোর্স, তাফিক হারমায়িন, খেদমতে ইসলাম, ইসলাহুল মুসলেমিন, ইসলামী লিবারেশন টাইগার, তা-আমির-উদ্-দিন, তাওহিদি জনতা। এসব জঙ্গি সংগঠনগুলো বিদেশি উৎস এবং দেশের ভিতরের মৌলবাদের অর্থনীতি থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে।

মৌলবাদের অর্থনীতির উল্লিখিত মডেলসমূহের ব্যবস্থাপনা-পরিচালন কৌশল সাধারণ ব্যবসায়ের নীতি-কৌশল থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন । তাদের অর্থনৈতিক মডেল পরিচালন কৌশলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: (১) প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত; (২) প্রতিটি মডেলে বহুস্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূল নীতি-নির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ; (৩) বিভিন্ন মডেলের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকলেও উচ্চস্তরের কো-অর্ডিনেটরদের পরস্পর পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয় (এক ধরণের গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বলা চলে); (৪) প্রতিটি মডেলই সুসংবদ্ধ-সুশৃংখল (সামরিক শৃংখলার আদলে) ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান; (৫) যে কোনো মডেল যখনই আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয় তা যথাসাধ্য দ্রুত অন্যস্থানে বাস্তবায়িত করা হয় । সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞানকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট[৬] । এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ । আর এ আবেগ আসে ক্রমবর্ধমান অসমতা থেকে তথাপি এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা সৃজনশীল এবং আধুনিকতার ধারক বাহকও । সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বোমা বিজ্ঞান-তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানসহ মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট ।

মূল ধারার 'ইসলাম' নামাঙ্কিত রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে মৌলবাদী জঙ্গীদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট; আর্থিক লেনদেন থেকে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত । সম্প্রতি দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত 'জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) নামে একটি ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠন (১৭ আগস্ট ২০০৫) জেলা প্রশাসন কার্যালয় এবং আদালত প্রাঙ্গণে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । এ ঘটনার পর একশ্রেণীর সুচতুর ব্যক্তি হঠাৎ করেই মূলধারা 'ইসলামী' দলের সাথে ধর্মীয় জঙ্গীবাদীদের সম্পর্ক অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায় । হঠাৎ সম্পর্কহীন করার তাদের এই অপচেষ্টা এবং 'পৃথক' করে ভাববার অপপ্রয়াস কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠা পায়নি কিংবা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । অধিকন্তু মূল 'ইসলামী' দলের সাথে উগ্রবাদীদের সম্পর্ক আরও যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে । এটা হওয়ার কারণ হল: শুধু সশস্ত্র জিহাদীরাই নয়, মূল ধারার 'ইসলামী' দল ও তাদের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল', দলীয় প্রধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, 'ইসলামী আইন খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং অপেক্ষা করুন এবং দেখুন'......... নির্দেশনা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন ।' এদেশের প্রধান ইসলামী দল প্রকাশ্যে এখনও নাম উল্লেখ করে বোমা বিস্ফোরণ কর্মকাণ্ড এবং বোমা নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো নিন্দা জ্ঞাপন বা তাদের মত অন্য সবায়ের বাতিল (জেএমবি) করার কথা বলেনি । যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, জেএমবি'র গ্রেফতার হওয়া সকল নেতা-কর্মীরা মূল ধারার ইসলাম নামাঙ্কিত রাজনৈতিক দল অথবা অথবা তাদের ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল । বোমা হামলা কার্যক্রমকে সফল করে জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হতো মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে এবং জঙ্গীদের প্রায় সব মামলাতেই তাদের প্রশাসনিক প্রভাব সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে । অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই তাদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে । কিন্তু যেখানেই তারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা তাড়াতাড়ি করে গ্রেফতার হওয়া সংশ্লিষ্ট জঙ্গীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে । এসব বিষয়ে বিভিন্ন খবর খুব

[৬] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মত সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে । মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সদব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে । আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করে । হিন্দু জঙ্গীরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (Giddens 2003: 50-51) ।

দ্রুত বাংলাদেশের সকল প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলো হচ্ছে: প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫, শিরোনাম– 'চট্টগ্রামে জামায়াত-এ-ইসলামী'র সাথে জড়িত পাঁচ জেএমবি নেতা গ্রেফতার; ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন; দি ডেইলি স্টার ৩১ আগস্ট ২০০৫– 'এক বছরে দাতাদের কাছে থেকে ৩৪টি ইসলামী এনজিও দুইশত কোটি টাকার বেশি সাহায্য পেয়েছে; ডেইলি স্টার ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 'জামায়াত জঙ্গী সম্পর্ক এখন স্পষ্ট'; ইত্তেফাক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 'এক হাজারের অধিক জঙ্গীর মুক্তি, এদের মধ্যে ৪০% জামায়াত ইসলামী দলের; ডেইলি স্টার ৫ ডিসেম্বর ২০০৫ ' ২৯ নভেম্বরের দু'টি আদালত প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড ঘটার মাত্র ক'দিন আগেই সরকার কুয়েতী এনজিও রিভাইভাল ইসলামীক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস) নামের একটি শীর্ষস্থানীয় দাতা সংস্থা জঙ্গীদের জন্য দেয়া প্রায় ২ কোটি টাকার সাহায্য ছাড় দেয়ার জন্য সম্মতি দেয়।

অনেকেই মনে করেন এ দেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীরা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সমুদয় অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে। এ ধারণা বহুলাংশে মিথ্যে হতে পারে যদিও সম-মতাদর্শী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আর সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আসে। "জঙ্গীদের সব অর্থই বিদেশ থেকে আসে" এ কথা বলার অর্থ এমনও হতে পারে যে আসলে আমরা তাদের প্রকৃত শক্তি অবমূল্যায়ন করছি। "জঙ্গীদের সব অর্থই বিদেশ থেকে আসে"– এ ধারণা বহুলাংশে সত্য নয় এজন্য যে এ দেশে মৌলবাদ ইতোমধ্যে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে তা হল এরকম– উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে[৭], একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর একাংশ নূতন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মুনাফার ব্যয়ের মধ্যে আছে রাজনৈতিক কর্মীদের বেতন ভাতা, দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে ব্যয়, জনসভা আয়োজনে ব্যয়, অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা এবং জঙ্গী কর্মকাণ্ড সংগঠন। জঙ্গী কর্মকাণ্ড নিয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে যে এ দেশে মৌলবাদীদের ১৪৮-টি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন বার্ষিক নীট মুনাফা আনুমানিক ১২০০ কোটি টাকা। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭% আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যার মধ্যে আছে ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০.৮% আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা[৮] থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮%; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪%; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২%; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৩%, যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫%; আর সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৫.৮% (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)। নীট মুনাফার এ প্যাটার্ন বেশ

৭ রাজনৈতিক কর্মীদের বেতন ভাতা; দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে ব্যয়; অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা (ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় অভিযোগ তুলেছে যে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ১৪৮-টি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে– এ অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে খণ্ডন করা হয়নি। অনুরূপ অভিযোগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও।)

৮ এদেশে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আছে আনুমানিক ১২৪ বেসরকারি সংস্থা। এদের মধ্যে মধ্যে ১০টি সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামী এনজিও উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্তহ– যেমন , 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস), রাবিতা আল-আলম, আল-ইসলামী, সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্মস, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, ইসলামিক রিলিফ একেন্সি, আল– ফরকাল ফাউণ্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, মুসলিম এইড বাংলাদেশ। বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের অধিকাংশই এসব সংগঠন পায় মধ্য প্রাচ্য থেকে। এদের অনেকেই এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের দাতা সংস্থার অর্থ পেয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা সরাসরি পেয়ে থাকেন, যার হিসেব পত্তর সরকারি নথি পত্রে অনুপস্থিত। মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য সংস্থার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা এবং পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটানো। এদেশে মূল ধারায় বেসরকারি সংস্থারা যখন নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন মৌলবাদী বেসরকারি সংস্কৃতি পিছিয়ে নেই, তবে তারা বলছেন "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে পর্দার অন্তরালে"।

অনুমান নির্ভর হলেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশ ধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নীট মুনাফার যে কাঠামো দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথে যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ।

সারণি ৩: মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আনুমানিক বার্ষিক নীট মুনাফা

	অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নীট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নীট মুনাফার শতাংশ
০১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোং ইত্যাদি	৩২৫	২৭.০
০২.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদি	১৩০	১০.৮
০৩.	ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	১২৫	১০.৪
০৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার	১১০	৯.২
০৫.	যোগাযোগ: ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, কার, তিন চাকার সিএনজি ইত্যাদি	৯০	৭.৫
০৬.	জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	১০০	৮.৩
০৭.	সংবাদ মাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তি	৭০	৫.৮
০৮.	বেসরকারি সংস্থা	২৫০	২০.৮
	মোট	১২০০	১০০

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি যদি বছরে ১২০০ কোটি টাকা নীট মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ মাত্রা যা মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রা নির্দেশ করে– হবে নিম্নরূপ: (১)দেশের মোট বার্ষিক জাতীয় বিনিয়োগের (চলতি মূল্যে) ১.৫৩% এর সমপরিমাণ, (২) দেশের মোট বার্ষিক বেসরকারি বিনিয়োগের ২.১% এর সমপরিমাণ, (৩) সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ৩.৩%এর সমপরিমাণ, (৪) দেশের বার্ষিক রপ্তানী আয়ের ৩.৭% এর সমপরিমাণ, (৫) সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৬% এর সমপরিমাণ, (৬) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ১২% এর সমপরিমাণ।

সেই সাথে বিকাশ-বিস্তৃতির সম্ভাবনা নির্দেশে আরো গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে যেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৭.৫% থেকে ৯%) মূল ধারার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৪.৫% থেকে ৫%)-এর তুলনায় অধিক সেহেতু অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে– অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের খুব একটা অবকাশ নেই। অর্থাৎ প্রবণতাটা এমন যে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে বেশি জায়গা দখল করতে পারে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অংশ আর সরকারের মধ্যে তাদের অংশ বৃদ্ধিতে মৌলবাদী অর্থনীতি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীত্ব যে রাষ্ট্রকেই জোরদখল করতে চায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এ জন্য যে: (১) তারা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতসমূহে বিনিয়োগ করছে, অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় তারা যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুন না কেন ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা অনেকের চেয়ে অধিকতর সজাগ-সচেতন; (২) তারা স্ট্র্যাটেজিক বিনিয়োগে অধিক উৎসাহি; (৩) বিনিয়োগের খাত নির্ধারণে তারা দ্রুত জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রগুলিকেই বেছে নিয়েছে; (৪) তাদের খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিনিয়োগ কাঠামো যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ; (৫) তাদের বার্ষিক নীট মুনাফার মাত্র ১০ শতাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে ৫ লাখ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিযুক্তি দেয়া সম্ভব– তারা সেটা করে এবং অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দেয়; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের

স্ট্রাটেজিক অবস্থানে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ক্যাডারদের পরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহার করে; এবং (৭) সশস্ত্র জঙ্গীরা এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে জঙ্গীরা ধরা পড়লে তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার ভিতরে কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেবার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়; চিহ্নিত জঙ্গীদের ধরে ছেড়ে দিতে হয়; আর তাদের নিয়ন্ত্রক গড-ফাদাররা সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

বাংলাদেশে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আছে আনুমানিক ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা। এসব সংস্থা-প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ– বিভিন্নভাবে জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। অনেকগুলোই সরাসরি জঙ্গী সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। এদের কর্মকাণ্ড পরিচালনের আর্থিক উৎস দেশ ও বিদেশ উভয়ই। অভ্যন্তরীণ উৎস হল উল্লেখিত আর্থিক খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মকাণ্ড উদ্ভূত নীট মুনাফা। আর বিদেশি উৎসের অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরাসরি পেয়ে থাকেন, যার হিসেব পত্তর সরকারি নথি পত্রে অনুপস্থিত। এসব লেনদেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইদানিং (বিগত সরকারের আমলে) এমনও দেখা গেছে যে জঙ্গীবাদী সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করার পরেও ঐ সংস্থার নামে অনেক টাকার বাহক-চেক পাশ করা হয়েছে। মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংস্থার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা এবং পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটানো। এদেশে মূল ধারায় বেসরকারি সংস্থারা যখন নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন মৌলবাদী বেসরকারি সংস্থারাও পিছিয়ে নেই, তবে তারা বলছেন "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে পর্দার অন্তরালে", "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে স্বামীর পায়ের নিচে– কারণ ওখানেই বেহেশত"। কৌশলগত কারণেই নারীরা বিশেষত: দরিদ্র নারীরা মৌলবাদী বেসরকারি সংস্থাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট।

মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ণয়ের সর্বোত্তম 'বিকল্প মানদণ্ড' হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় উগ্রতাবাদের সম্পৃক্ততা ও ব্যাপকতাকে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে এ ধরনের ধর্মীয় উগ্রতাবাদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র (সারণি ৪ দ্রষ্টব্য)। যার সাথে যুক্ত হয়েছে 'লুক্কায়িত থেকে প্রকাশ্য' পদ্ধতি, 'এক মুখী' হাতিয়ারের পরিবর্তে বহুমুখী বিধ্বংসী বোমা ব্যবহার'। এসবের বিশ্লেষণে ধর্মীয় উগ্রতাবাদীদের সুদূরপ্রসারী কিছু উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১. রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের মাধ্যমে সংস্কৃতি ধারায় পরিবর্তন আনা যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য তাদের আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য সরকারি প্রশাসন যন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন: জেলা প্রশাসক), ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন থিয়েটার, প্রক্ষাগৃহ, জনসমাবেশ, কমিউনিটি সেন্টার, সুফি-সমাধিস্থল, লাইব্রেরীসহ বিচার বিভাগ (আদালত)।
২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসীন থাকলে এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রবণতা হ্রাস পায়।
৩. ডানপন্থী বা ধর্মনির্ভর দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলে বিস্তার ঘটে এদের সন্ত্রাসী তৎপরতা।
৪. তাদের এ অপতৎপরতা বাধাগ্রস্ত না হলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের ভূমিকা না থাকলেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কোনো সরকার যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, উগ্রবাদীরা তখন তাদের 'শক্তি সামর্থকে শানিত করে'।

সারণি ৪: বাংলাদেশে সংঘটিত ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বড় ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ১৯৯৯-২০০৫

ঘটনার তারিখ	লক্ষ্যবস্তু/ মাত্রা/ প্রকৃতি এবং স্থান	প্রত্যক্ষ ক্ষতি
৬ মার্চ ১৯৯৯	উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, যশোর	নিহত ১০, আহত ১০৫
৮ অক্টোবর ১৯৯৯	আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ৮, আহত ৩২
২০ জানুয়ারী ২০০১	সিপিবি'র সভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ৭, আহত ৫২
১৪ এপ্রিল ২০০১	পহেলা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ১১, আহত ১২০
৩ জুন ২০০১	গীর্জায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০, আহত ২৫
১৬ জুন ২০০১	আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নারায়নগঞ্জ	নিহত ২২, আহত ৫০
১৬ নভেম্বর ২০০১	হিন্দু শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে হত্যা	নিহত
২১ এপ্রিল ২০০২	বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহাথেরো হত্যা	নিহত
৭ ডিসেম্বর ২০০২	৪টি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহ	নিহত ২৭, আহত ২৯৮
১৭ জানুয়ারী ২০০৩	সুফি সামধিতে বোমা বিস্ফোরণ, শখিপুর, টাঙ্গাইল	নিহত ৭, আহত ২৬
১২ জানুয়ারী ২০০৪	হযরত শাহজালাল মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৫, আহত ৫২
২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪	অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের উপর আকস্মিক আক্রমন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	গুরুতর আহত এবং পরবর্তীতে মৃত্যু
২ এপ্রিল ২০০৪	হঠাৎ অস্ত্রবাহী জাহাজ, চট্টগ্রাম বন্দর, ২০০০ অটোমেটিক, সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৪০টি রকেট চালিত গ্রেনেডে, ২৫,০০০ হ্যান্ড গ্রেনেড, ১.৮ মিলিয়ন রাউন্ড ছোট বড় গুলি ও বারুদ।	
২১ মে ২০০৪	হযরত শাহজালালের মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৩, ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ আহত ৬৫
২১ আগস্ট ২০০৪	আওয়ামী লীগের (শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	নিহত ২৪, আহত ৫০৩
২৭ জানুয়ারী ২০০৫	বিরোধীদলের (আওয়ামীলীগ) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়া সহ নিহত ৫
১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫	এনজিও (ব্র্যাক) অফিসে বোমা হামলা, রায়পুর, নওগাঁ	-
২০০৩-২০০৫	বাংলাভাই দল কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত (জেএমবি), নর্থবেঙ্গল	নিহ, ৩৫, আহত ১২৩
৩ অক্টোবর ২০০৫	৩ টা আদালত ভবনে বোমা হামলা (চাঁদপুর, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম)	নিহত ২, আহত ৩৯
১৪ নভেম্বর ২০০৫	সরকারি আবাসিক এলাকায় বোমা হামলা, ঝালকাঠি	নিহত ২, আহত ৪
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	আইনজীবীভবনে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১০, আহত ২২০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	পুলিশ বক্সে বোমা হামলা, চট্টগ্রাম	নিহত ৩, আহত ২৫
১ ডিসেম্বর ২০০৫	জেলা প্রশাসক অফিসে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১, আহত ৫০
৮ ডিসেম্বর ২০০৫	উদীচী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নেত্রকোণা	নিহত ৮, আহত ১০০

উৎস: মিডিয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক সংকলিত। বিস্তারিত দেখুন: সংবাদ ৭,৮ মার্চ ১৯৯৯, ইত্তেফাক ৯ অক্টোবর ১৯৯৯; সংবাদ ২১ জানুয়ারী ২০০১ এবং জনকণ্ঠ ২২ জানুয়ারী ২০০১; প্রথম আলো ১৫ এপ্রিল এবং যুগান্তর ১৬ এপ্রিল ২০০১; ইত্তেফাক ৪ জুন এবং সংবাদ ৫ জুন ২০০; আজকের কাগজ এবং ভোরের কাগজ ১৭ জুন ২০০১; জনকণ্ঠ ১৭ নভেম্বর ২০০১; জনকণ্ঠ ২২ এপ্রিল ২০০২; ডেইলি স্টার এবং বাংলাদেশ অবজারভার ৮ ডিসেম্বর ২০০২; ডেইলি স্টার ১৮ জানুয়ারী ২০০৩; ডেইলি স্টার ১৩ জানুয়ারী ২০০৪; ইত্তেফাক ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৪; প্রথম আলো এবং যুগান্তর ২২ মে ২০০৪; ইত্তেফাক, প্রথম আলো , যুগান্তর, জনকণ্ঠ ২২ আগস্ট ২০০৪; আজকের কাগজ,ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ ২৮ জানুয়ারী ২০০৫, সংবাদ, ভোরের কাজগ, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫; ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ অবজারভার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সকল প্রধান দৈনিক ১৮-১৯ আগস্ট ২০০৫; জনকণ্ঠ ৪,৫ অক্টোবর ২০০৫; সংবাদ ১৫ নভেম্বর ২০০৫, ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ ৩০ নভেম্বর ২০০৪; জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, যুগান্তর ২ ডিসেম্বর ২০০৫; সংবাদ জনকণ্ঠ, যুগান্তর ৯-১০ ডিসেম্বর ২০০৫।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতির বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার বিজয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাত্রায়

আত্মতুষ্ট ছিলাম। সঙ্গত কারণও ছিল। জাতি হিসেবে আমরা এইই প্রথম দেখলাম যে গণতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা– এ চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মূল স্রোতের ধর্মীয় চেতনা যদি উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী হয়ে থাকে এবং তা বংশপরম্পরা মানস-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ঐ চার মূলনীতিও আমাদের সুপ্ত আকাঙ্খার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। আমাদের আত্মতুষ্টির কারণ এও হতে পারে যে সম্ভবত: তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে আমরাই প্রথম, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে (secularism, ধর্মহীনতা নয়) সংবিধানে (১৯৭২-এর) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম (অবশ্য পরে তা বাতিল হতে হতে 'ইসলাম হইবে রাষ্ট্রধর্ম'-তে রূপান্তরিত হয়েছে)। আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্খার কাগুজে প্রকাশ-এ আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি (যাদের ক্ষমা করে আমরা ইসলাম ধর্মের মূল স্রোতের বাহক পরিগণিত হতে পারি) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো যে রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের জীবনে মৌলিক কোনো পবিবর্তন ঘটবে না; তারা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে পেরেছিলো যে এ মানুষই কয়েকবছরের মধ্যে চলমান নেতৃত্বের প্রতি মোহহীন হবে, আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের (মুক্তিসংগ্রামে পরাজিতদের) বিজয় নিশ্চিত হবে। সমসাময়িককালে প্রগতির গতি এগুলো ঢিমে তালে আর তারা লক্ষ্যার্জনে জোরকদমে অথচ বেশ গোপনে এগুবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো–যেমন, গ্রাম থেকে শহর দখল; কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচিতি গোপন রাখা ইত্যাদি। যে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিই হলো গ্রাম দখল (ডিপ টিউবওয়েলকেন্দ্রিক সমিতি, কৃষক সমিতি, মসজিদ-মাদ্রাসা– মাধ্যম যাই হোক না কেন), ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র অবস্থান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান দখল, আর বেসরকারি সংস্থার নামে ব্যাপকভাবে গ্রাম ও শহরের স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ ও তা সুদৃঢ়করণ। এ কৌশল কার্যকর করতে মৌলবাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমূহ যেমন নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানও শক্তিশালী হয়েছে। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব যত না ভাববাদী তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বাস্তববাদী—বস্তুবাদী। গত অর্ধ শতাব্দীর এ প্রক্রিয়ায় এখন তাদের অর্জনটা এমন যে একদিকে প্রতিটি জাতীয় সংসদ আসনে তারা গড়ে ১০,০০০-১৫,০০০ ভোট সংগ্রহে সক্ষম আর অন্যদিকে নির্বাচনে কোটি টাকার কালো টাকা ও প্রয়োজনীয় পেশী শক্তি সরবরাহের ক্ষমতাও তাদের এখন আছে। আর অন্যদিকে তারা এখন মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই অতি উচ্চমাত্রার সেনা-সুক্ষতাসহ সারা দেশে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনে এবং কল্পনাতীত হত্যাযজ্ঞ সাধনে সক্ষম। জনগণ বাধা না দিলে তারা তা অবশ্যই করবে, তার পুনরাবৃত্তি হবে এবং এসবের তীব্রতা ও ক্ষতিমাত্রা বাড়তে থাকবে। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়। এ প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে আন্তসম্পর্কিত ও কৌশলিক সুসংগঠিত (ছক-২ দ্রষ্টব্য)।

দেশ পড়েছে এক জটিল অবস্থায়। এ এক দুষ্টচক্র যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীবাদ। এ জঙ্গীবাদ অতীতে তাদের জঙ্গীত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; প্রায় প্রতিদিনই তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করছে এবং প্রতিদিনই তারা নীরিহ মানুষ হত্যা করছে; তাদের বোমায় ইতোমধ্যে বহু নীরিহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার মানুষ এবং প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছেন এবং প্রায় সকলেই একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অনুসারি। আর বড় ধরণের সশস্ত্র জঙ্গীত্ব প্রদর্শন কর হঠাৎ সময় বুঝে বেশ কিছু দিন ঘাপটি মেরে থাকতেও তারা পারদর্শী। যুদ্ধের সব কৌশলই তারা যথেষ্ট রপ্ত করেছে। তারা জানে "কখনও কখনও যুদ্ধে পিছিয়ে আসা পরাজয়ের লক্ষণ নয়, তা জয়েরও পূর্বশর্ত"।

উগ্র জঙ্গীবাদ এখন যে "আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতি" চালু করেছে তার ফলে জাতী-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জীবনই এখন বিপন্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক

জঙ্গীবাদ-উদ্ভুত বিপন্নতার কিছু নূতন মাত্রা লক্ষণীয়: (১) এ জঙ্গীত্ব দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের "সরবরাহ চেইন" ভেঙ্গে ফেলে উৎপাদন-বণ্টন-পরিভোগ-এর স্বাভাবিক সিষ্টেমকেই ভেঙ্গে ফেলার সুদূর প্রসারী-অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। (২) এ জঙ্গীত্ব এখন দেশের গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র শহর ও শহরতলীতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করছে- যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ইঞ্জিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কর্মকাণ্ড বিনষ্টের মাধ্যমে পুরো অর্থনীতিকে নীচে থেকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। (৩) এ জঙ্গীত্ব তাদের কমর্কাণ্ড দিয়ে এমন এক ত্রাস সৃষ্ঠি করেছে যখন যে কোন সময় গ্রামের হাটবাজার সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলতঃ গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে সার, ডিজেল, বীজসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যার ফলে আশংকা করা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুতদারী বাড়ছে/বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রূদ্ধ হচ্ছে/হবে। লক্ষ্যণীয় যে গত বছর তারা এসবই করছে "শীতের শস্য মৌসুমে" যে মৌসুম অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক। ফলে এ আশংকা আছে যে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কালোবাজারী-মজুতদারী বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনজীবণ অধিকতর দুর্বিষহ হবে, আর অন্যদিকে এ অবস্থাকেই আবার জঙ্গীরা তাদের জঙ্গীত্ব আরো বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে।

ছক ২: মৌলবাদি শক্তিসমূহের কৌশলিক আন্তসম্পর্ক

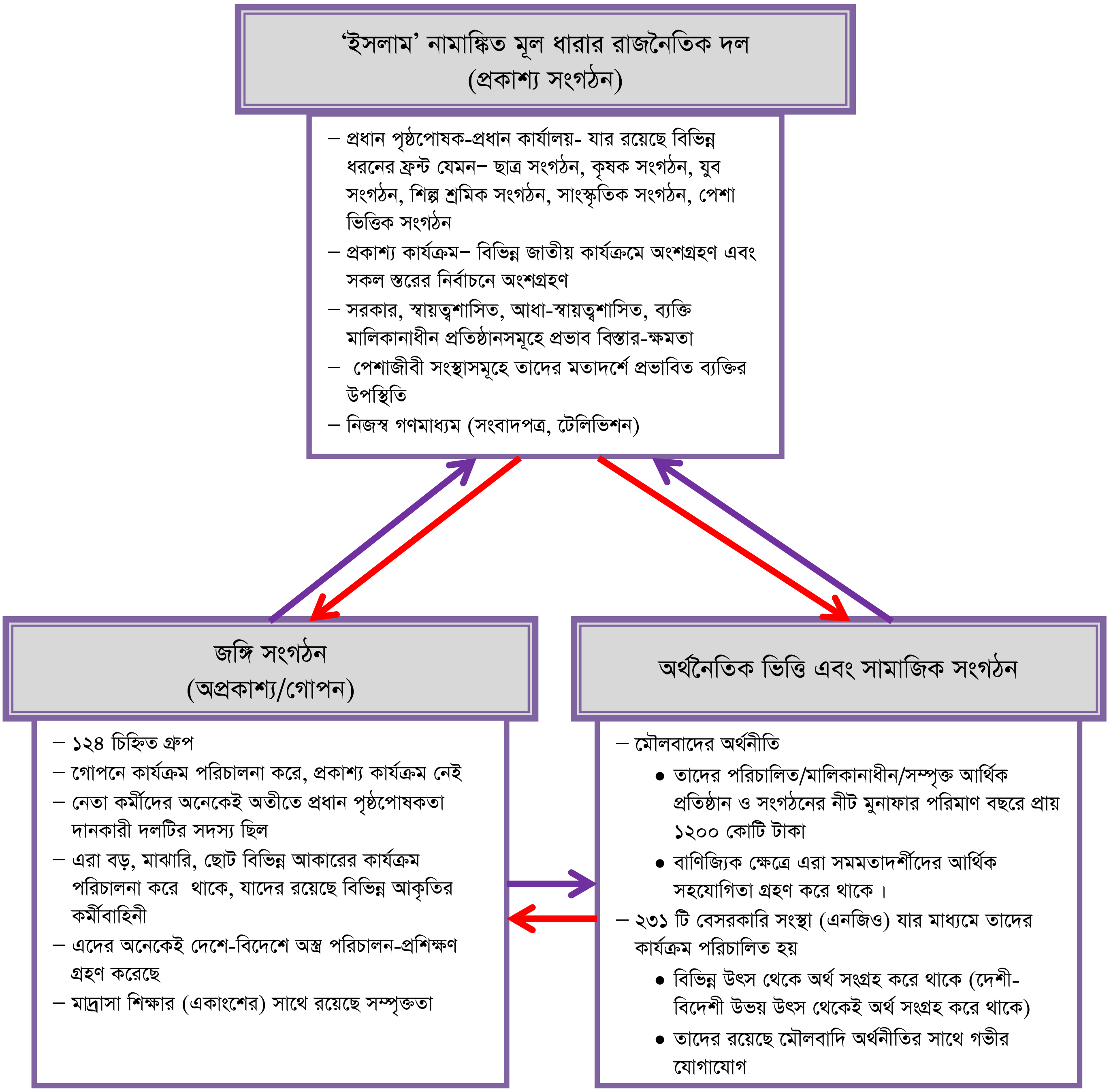

(৪) এ জঙ্গীত্ব সমগ্র দেশে ভয়-ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে যে হারে আত্মঘাতি বোমা ব্যবহার করছে ও করবে তার ফলে দেশজ বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হয়েছে/হবে। আর দেশজ বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হলে বিদেশি বিনিয়োগ অধিকতর অনুৎসাহিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগহীন এক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থা। আর এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অসম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় এ জন্যেও যে তারা ইসলামের মুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র (খোমেনি পদ্ধতি)। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। এ পদ্ধতিতে

- একদিকে বলা হবে ইসলামে নারী নেতৃত্ব অস্বীকৃত, আর অন্যদিকে সরকারে জায়গা পেলে নারী নেতৃত্বে অসুবিধে নেই;
- একদিকে বলা হবে ইসলামে সুদ হারাম, আর অন্য দিকে তাদের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ননামে চুটিয়ে সুদ খেলে অসুবিধে নেই;
- একদিকে যেমন পবিত্র কোরান-হাদিছ যথেচ্ছ ব্যবহার করা হবে, আর অন্যদিকে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রলুব্ধ করে মানুষকে তাদের জনসভায় আনা হবে;
- একদিকে বলা হবে ইসলামে মানুষ হত্যা-আত্মহত্যা মহাপাপ, আর অন্যদিকে বলা হবে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য নিরীহ মানুষ হত্যাই জেহাদ;
- একদিকে বলা হবে ইসলামে মদ্য পান হারাম, আর অন্যদিকে তারা সরকারের অংশীদার হলে মদের শুল্ক কমলে তাদের অসুবিধে নেই;
- একদিকে বলা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলাম বিরোধী, আর অন্যদিকে সরকারের অংশীদার হবার সময়ে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন জায়েজ;
- একদিকে বলা হবে ভারত শত্রু রাষ্ট্র, আর অন্যদিকে সরকারের মন্ত্রী থাকাকালে ভারতের সাথে অন্যায্য চুক্তি স্বাক্ষরে অসুবিধে নেই।

সবকিছু মিলে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এক কথায় এরকম: স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী জঙ্গী শক্তি জানে তারা কি চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কি চাই; ওরা জানে ধর্মের 'mythos' আর বাস্তব জীবনের 'logos'-এর সমন্বয়ে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা ধর্মের দোহাই দিয়ে খুন-খারাবিসহ যা কিছু করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, দারিদ্র, বঞ্চনা, এবং যুব সমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা, অনৈক্য ও নিষ্ক্রিয়তা ওদের ভিত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে।

মৌলবাদী জঙ্গীত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা রোধে অসাম্প্রদায়িক মানুষের ঐক্যের বিকল্প নেই

ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারে ঐতিহাসিকভাবে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ, কোথাও শান্তিপূর্ণ পথ আবার কোথাও এ দু'য়ের মিশ্রিত পথের ভূমিকা জানা আছে। লক্ষণীয় যে যেখানেই যুদ্ধ-তরবারিকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই হয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নয়ত বা যুদ্ধংদেহী রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি জেঁকে বসেছে। কিন্তু যেখানেই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার এগিয়েছে– যেমন আমাদের দেশে ওলি- আওলিয়া-সুফি-সাধকরা– সেখানে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনও শক্ত ভিত পায়নি। উল্টো যখনই ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে চেষ্টা হয়েছে তখনই তা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ এ দেশে শান্তিপূর্ণ পথে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের ফলে মানুষ বংশপরম্পরা ধর্মভীরু হয়েছেন কিন্তু বক-ধার্মিক বা ধর্মান্ধ হন'নি। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারণাটি এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাহন হয়েছে। আর সে কারণেই মৌলবাদের অর্থনীতি এ দেশে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ঐ অর্থনীতির শক্তি ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সম্ভব হবে না।

সুতরাং বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম "স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি জানে তারা কি চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কি চাই; ওরা জানে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা যা করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, যুব সমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা ও অনৈক্য ওদের ভীত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে।" (আবুল বারকাত, "গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুচ্ছে", দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৪)।

এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ বেশ প্রাসঙ্গিক হতে পারে: (১) এ দেশে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ৬০ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বি মানুষের যে ৭৮ লাখ বিঘা সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদ গ্রাস করা হয়েছে তা গ্রাস করেছেন মাত্র ০.৪% মুসলমান (গ্রাসকারীরা সবাই যদি মুসলমান হন) – অর্থাৎ ৯৯.৬% মুসলমান ভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্পদ জোরদখলের সাথে সম্পৃক্ত নন। অনেকেই কিন্তু এটা হিন্দু-বনাম মুসলমান সমীকরণে রূপান্তরের অপপ্রয়াস চালান; (২) বাগমারায় উগ্র-জঙ্গী মৌলবাদ– বাংলাভাইকে– তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্র যতই মদত দিক না কেন– এলাকার মানুষই কিন্তু জোটবদ্ধভাবে জঙ্গীত্ব মোকাবেলা করেছে– মূল ধর্ম-গোষ্ঠির অসাম্প্রদায়িক সুপ্ত চেতনার এ-এক স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ; (৩) ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ভেঙ্গে পড়ার পরে ঢাকা মেডিকেলসহ অন্যান্য হাসপাতালে হিন্দু ধর্মাবলম্বি আহত ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে রক্ত দানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন– তা নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অপার শক্তিকেই নির্দেশ করে; (৪) ইসলাম ধর্মের পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক এ দেশের একজন সাধারণ মুসলমানও কি সুইসাইড বোমাবাজদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন? না কি প্রায় সকলেই মনে করেন যে এসবই ধর্মের নামে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক অধর্মের কাজ?

এত কিছুর পরেও, "আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকলে বিপদ নেই"– এমনটি ভাববার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। কারণ বিষয়টি গভীরভাবে রাজনৈতিক– ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রাগ্রসর পরিবেশ সৃষ্টির। অতএব লড়াইটিও রাজনৈতিক। মৌলবাদী জঙ্গীত্বের ভিত যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে ও করছে তাতে লড়াইটা হতে হবে সর্বব্যাপী বহুমাত্রিক ও বহুকেন্দ্রিক। এ লড়াই অনগ্রসর মানস-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াই। এ লড়াই সুফি-সাধক-ওলামাদের জন্য মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারা সমুন্নত করার লড়াই। সুতরাং এ লড়াইয়ে একদিকে ইসলাম ধর্মের উগ্র

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধারার মোকাবেলায় মানবকল্যাণকামী সুফি-উলামা ধারার প্রবক্তাদের– যারা ঐতিহাসিকভাবেই মূল ধারার প্রবক্তা– মানবকল্যাণে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন এবং মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রসার নিমিত্ত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গীত্বের ভিত্তিমূল দুর্বল করার একমাত্র পথ।

মৌলবাদী সশস্ত্র জঙ্গীত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত: নিশ্চিত যে "এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে, আর তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যে ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। বাস্তবে যা সম্ভব তা হল "ক্ষতি হ্রাসের" কৌশল দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা: (১) জঙ্গীদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা; (২) জঙ্গীদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎসমূখ বন্ধ করা; সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা; (৩) জঙ্গী কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে ধরা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সবদিক থেকে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা; (৪) সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গীত্ব-প্রমোটার তাদেরকে সরকার থেকে বহিষ্কার করা জোরদার করা; (৫) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা; (৬) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গীদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উম্মোচনে সিরিয়াস প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই এ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ইত্যাদি। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি– তা হলো দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল অসাম্প্রদায়িক ও মানব হিতৈষি শক্তির সুদৃঢ় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির দারিদ্র দূর না করে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিলুপ্ত না করে ধর্মীয় জঙ্গীত্ব চিরস্থায়ীভাবে রোধ করা যাবে না। এ জন্য এ মুহূর্তেই প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সাহসী নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আমাদের প্রত্যাশা, একটি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল অঙ্গীকার।